দ্বন্দ্বমূলক
ও
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

জে ভি স্ট্যালিন

গণদাবী
প্রকাশনা

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — জে ভি স্ট্যালিন

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ৫ মার্চ, ২০২৬

প্রকাশক ঃ সম্পাদক
গণদাবী
৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩
ganadabi@gmail.com
9433451998, 9432889347

মুদ্রক ঃ গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুজগতের সমস্ত ঘটনাকে বিচারের ক্ষেত্রে এর দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিই বস্তু এবং সমাজ সম্পর্কে আমাদের যথাযথ ভাবে সত্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। তাই প্রতিটি কমিউনিস্ট কর্মীরই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে মহান মার্ক্স-এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান। মহান স্ট্যালিন মার্ক্সবাদী দর্শনের উপর তাঁর গভীর জ্ঞান এবং দক্ষতা থেকেই এই দ্বন্দ্বতত্ত্বকে তাঁর 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' লেখাটিতে অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাবে তুলে ধরেন। লেখাটি ২০০৪ সালে স্ট্যালিন মৃত্যুবার্ষিকীতে গণদাবী বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বন্দ্বতত্ত্ব আয়ত্ত করতে বর্তমান কমিউনিস্ট কর্মীদের সাহায্য করবে বলেই লেখাটি আমরা পুস্তকাকারে প্রকাশ করলাম।

সম্পাদক

৫ মার্চ, ২০২৬ গণদাবী

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

জে ভি স্ট্যালিন

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এই দর্শনের নাম দ্বন্দ্বমূলক-বস্তুবাদ। কারণ বস্তুজগতের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে বিচারের ক্ষেত্রে এর দৃষ্টিভঙ্গি, সেগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে এর পদ্ধতি হল দ্বন্দ্বমূলক (ডায়ালেকটিক্যাল) এবং বস্তুজগতের সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা, ধারণা ও তত্ত্ব হল বস্তুবাদী। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলনীতিকে সমাজজীবন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সমাজবাস্তব ও সমাজবিকাশের ইতিহাস অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই মূল নীতিগুলিকে প্রয়োগ করেই গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

মার্ক্স-এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে প্রায়শই বলেছেন— দার্শনিক হিসাবে হেগেলই প্রথম দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রবদ্ধ করেন। অবশ্যই এ কথার অর্থ এই নয় যে, মার্ক্স-এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বতত্ত্ব এবং হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব অবিকল একই জিনিস। বস্তুত, মার্ক্স ও এঙ্গেলস হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভাববাদী খোলসটা বর্জন করে তার 'যুক্তিসঙ্গত নির্যাসটি' গ্রহণ করে তাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়েছিলেন।

"আমার দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি" মার্ক্স বলেছেন, "হেগেলের থেকে কেবল ভিন্ন নয়, ঠিক তার বিপরীত। হেগেলের মতে, চিন্তাপ্রক্রিয়া— যাকে তিনি পরমভাব আখ্যা দিয়ে এমনকি একটা সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তায় রূপান্তরিত করেছেন— সেই পরমভাবই বস্তুজগতের স্রষ্টা, বস্তুজগৎ সেই পরমভাবেরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যরূপ। এর বিপরীতে, আমাদের কাছে ভাবজগৎ হল মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত এবং

চিন্তার আকারে রূপান্তরিত বস্তুজগৎ— এ ছাড়া আর কিছু নয়।'' (কার্ল মার্ক্স, ক্যাপিটাল ১ম খণ্ড, ২য় জার্মান সংস্করণের ভূমিকা)

বস্তুবাদ সম্পর্কে নিজেদের ধারণা তুলে ধরতে গিয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস প্রায়শই ফয়ারবাখের নাম করেছেন, দার্শনিক হিসাবে যিনি বস্তুবাদকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। যদিও তার মানে এই নয় যে, মার্ক্স-এঙ্গেলসের বস্তুবাদ এবং ফয়ারবাখের বস্তুবাদ অভিন্ন। বস্তুত, তাঁরা ফয়ারবাখের বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভাববাদী ও ধর্মনৈতিক ধ্যানধারণার অনাবশ্যক বোঝাকে বর্জন করে, এর ''অন্তর্নিহিত সারবস্তু''কে গ্রহণ ও তাকে আরও উন্নত করে বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী দার্শনিক তত্ত্বের স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সকলেই জানেন যে, ফয়ারবাখ মূলত বস্তুবাদী হলেও, বস্তুবাদ শব্দটি ব্যবহার করতে আপত্তি করেছিলেন। এঙ্গেলস বহু বার এ কথা বলেছেন— বস্তুবাদী ''ভিত্তির'' ওপর দাঁড়ালেও ফয়ারবাখ পুরনো ভাববাদী ধারণার হাত থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেননি। তিনি বলেছেন— ''ধর্মীয় দর্শন ও নৈতিকতা সম্পর্কে ফয়ারবাখের ধারণা বিচার করতে গেলেই তাঁর প্রকৃত ভাববাদী স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে।''

(কার্ল মার্কস; সিলেকটেড ওয়ার্কস, ইংরেজি সংস্করণ মস্কো, ১৯৪৬, ভল্যুম ১, পৃ ৩৭৩, ৩৭৫)

ডায়ালেকটিকস কথাটা এসেছে গ্রিক 'ডায়ালিগো' থেকে, যার মানে আলোচনা করা, তর্কবিতর্ক করা। প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তগুলির স্ববিরোধিতা উদঘাটন করা এবং সেই সব স্ববিরোধিতাকে অতিক্রম করার পথে সত্যে পৌঁছানোর পদ্ধতিকে প্রাচীনকালে বলা হত ডায়ালেকটিকস। প্রাচীনকালে এক দল দার্শনিক মনে করতেন চিন্তার স্ববিরোধিতা উদঘাটন ও পরস্পরবিরোধী মতামতের সংঘাতই সত্যে উপনীত হওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ। পরবর্তীকালে এই ডায়ালেকটিক (দ্বন্দ্বমূলক) চিন্তাপদ্ধতি প্রকৃতি জগতের ফেনোমেনাকে বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং প্রকৃতিকে জানার দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি হিসাবে গড়ে ওঠে। দ্বন্দ্বমূলক চিন্তাপদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সমস্ত কিছুকেই সর্বদা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল হিসাবে বিচার করা হয়। এই পদ্ধতি দেখায়— প্রকৃতিজগতের বিকাশ তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের বিকাশের ফল, অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের ফল।

মর্মবস্তুর দিক থেকে দ্বন্দ্বতত্ত্ব মেটাফিজিক্সের* সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

* সেই সব দর্শন যা পরম মূল সত্যকে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে এবং বুদ্ধিদ্বারা অনুমান সাপেক্ষ মনে করে। এক কথায় মেটাফিজিক্স বলতে ভাববাদ বোঝায়।

১। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি

মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই রকম—

ক) মেটাফিজিক্সের ঠিক বিপরীতে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মনে করে— প্রকৃতিজগৎ পরস্পর সম্পর্কহীন, স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন কিছু বস্তু বা ঘটনার কাকতলীয় সমাবেশ নয়। বরং দ্বন্দ্বতত্ত্ব দেখায় প্রকৃতিজগতে সব কিছুই পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। সামগ্রিক ভাবে সুসংহত এই বস্তুজগতে সমস্ত ফেনোমেনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের দ্বারা নির্ধারিত।

কাজেই, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দেখায়, পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, পৃথক ভাবে দেখলে প্রাকৃতিক কোনও ফেনোমেনাকে বোঝা সম্ভব নয়। প্রকৃতিজগতের কোনও ফেনোমেনাকে পরিবেশের বাইরে এনে বা তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করলে আমাদের কাছে তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বরং, প্রকৃতপক্ষে কোনও ফেনোমেনাকে যদি তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রেখে বিচার করা যায়, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে বুঝে বিচার করা যায় তবেই সেই ফেনোমেনাকে ঠিক মতো বোঝা সম্ভব।

খ) মেটাফিজিক্সের বিপরীতে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দেখায় যে, বিশ্বপ্রকৃতি গতিহীন নিশ্চল নয়, স্থাণু বা অপরিবর্তনীয় নয়, অবিরাম গতি ও পরিবর্তনের মধ্যে, নিরন্তর নতুনের আবির্ভাব ও বিকাশের মধ্যেই অবস্থান করে। প্রকৃতিজগতে সর্বদাই কিছু না কিছু নতুন সৃষ্টি হয় ও বিকশিত হয়, আবার কিছু না কিছুর আয়ু শেষ হয়, তার বিনাশ ঘটে।

তাই প্রতিটি ফেনোমেনাকে বিচারের সময় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রভাবের দিকগুলিকেই শুধু নয়, সেই সঙ্গে তার গতি, পরিবর্তন, বিকাশ, তার উদ্ভব ও বিনাশ— এই সমস্ত দিকগুলি নিয়ে বিচার করাই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি।

বিনাশের প্রক্রিয়া যার মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে, কোনও একটি বিশেষ সময়ে তাকে যতই দৃঢ় ও শক্তিশালী মনে হোক না কেন, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তাকে প্রাধান্য দেয় না। বরং একটা বিশেষ সময়ে আপাতভাবে দুর্বল মনে হলেও যা নবীন ও বিকাশশীল, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তাকেই প্রাধান্য দেয়। কারণ, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি অনুযায়ী যা নবীন ও বিকাশশীল, তা অপরাজেয়।

এঙ্গেলস বলেছেন— "সমগ্র প্রকৃতি জগতে— ক্ষুদ্রতম কণা থেকে শুরু করে বৃহত্তম বস্তু, এক কণা বালি থেকে সূর্য পর্যন্ত, প্রোটোজোয়া (এককোষী জীব) থেকে মানুষ পর্যন্ত — সব কিছুই সতত সৃষ্টি এবং বিনাশের ধারায় অন্তহীন

প্রবাহ, বিরামহীন গতি ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে।'' (ডায়ালেকটিকস অব নেচার)

এ জন্যই এঙ্গেলস আরও বলেছেন, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে ''প্রতিটি বস্তুকে এবং চিন্তাজগতে তার নিয়ত প্রতিফলনকে প্রধানত তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গী সংযোগ, গতি, সৃষ্টি ও বিনাশের পরিপ্রেক্ষিতে রেখেই বিচার করা হয়'' (অ্যান্টি ড্যুরিং)।

গ) মেটাফিজিক্স বলে, বিকাশের প্রক্রিয়া হল সরলরেখায় এগিয়ে যাওয়া, যেখানে শুধু পরিমাণগত পরিবর্তনই ঘটে, তা আর গুণগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় না। মেটাফিজিক্সের বিপরীতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব দেখায়, বিকাশের ধারায় সূক্ষ্ম ও দৃষ্টির অগোচর পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে সুস্পষ্ট মৌলিক পরিবর্তন, গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ ঘটে। এই ধারায় গুণগত পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধীরে ধীরে ঘটে না। ঘটে দ্রুত, আচমকা, এক অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে ভিন্ন অবস্থায় উত্তরণ ঘটে। এই উত্তরণ কার্যকারণহীন কাকতলীয় নয়, নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চোখের আড়ালে অবিরাম তিল তিল পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলেই গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি দেখায়, বিকাশের প্রক্রিয়া একটি বৃত্তাকার পথে বার বার ঘোরা নয় বা যা ঘটে গিয়েছে তারই গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি নয়। বিকাশের প্রক্রিয়া অগ্রাভিমুখী, উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ের দিকে তা এগিয়ে চলে। গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক দিন গড়ে ওঠা পুরনো পর্যায় থেকে গুণগত ভাবে নতুন পর্যায়ে উত্তরণ, সরল থেকে জটিল, নিম্নতর থেকে উচ্চতর স্তরে বিকাশই এর প্রকৃতি।

এঙ্গেলস বলেছেন— ''প্রকৃতিই হল দ্বন্দ্বতত্ত্বের সত্যতা প্রমাণের কষ্টিপাথর। এর সত্যতা যাচাইয়ের যে সব উপকরণ আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, তা অতীব সমৃদ্ধ। প্রতি দিন আরও বেশি বেশি যে সব উপকরণ আমাদের হাতে আসছে, তার দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রকৃতির কর্মপ্রক্রিয়া দ্বন্দ্বমূলক (ডায়ালেকটিক্যাল), মেটাফিজিক্যাল নয়। প্রকৃতির কর্মপ্রক্রিয়া চিরকাল একই ভাবে চলছে না, একই ভাবে বারবার বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে আসছে না। বরং বাস্তব ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তা চলেছে। এখানে সকলের আগে আমাদের ডারউইনের কথা স্মরণ করতে হবে। আজকের গোটা জীবজগৎ, জীবজন্তু, গাছপালা এবং সাথে সাথে মানুষও কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমবিকাশের ফলেই গড়ে উঠেছে— এ কথা প্রমাণ করার দ্বারা ডারউইন প্রকৃতিজগৎ সম্পর্কে মেটাফিজিক্যাল ধারণার উপর মারাত্মক আঘাত

হেনেছেন'' (সোসালিজম ঃ ইউটোপিয়ান অ্যান্ড সায়েন্টিফিক)।

দ্বন্দ্বমূলক ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াকে পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে গুণগত পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন— "পদার্থবিজ্ঞানে ... প্রতিটি রূপান্তর হল পরিমাণগত পরিবর্তনের পথে গুণগত পরিবর্তন। কোনও বস্তুর আভ্যন্তরীণ অথবা বাইরে থেকে প্রদত্ত গতির পরিমাণগত পরিবর্তনের ফল। যেমন, জলে তাপ দিলে প্রথমে তার তরল অবস্থার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু তাপ বাড়াতে বা কমাতে থাকলে একটা সময় আসে যখন তার বিদ্যমান অবস্থাটা বদলে যায়। এক ক্ষেত্রে জল বাষ্পে, অন্য ক্ষেত্রে বরফে পরিণত হয়। একটা ন্যূনতম পরিমাণ তড়িৎ শক্তি দিলে তবে একটা প্ল্যাটিনামের তার জ্বলে, আলো দেয়। প্রতিটি ধাতুকে গলাবার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় উত্তাপ দেওয়ার ব্যবস্থা যদি আমাদের থাকে তা হলে আমরা দেখতে পাব, একটি নির্দিষ্ট চাপে প্রতিটি তরলপদার্থের ঘনীভবন ও বাষ্পীভবনের একটি সুনির্দিষ্ট তাপাঙ্ক রয়েছে। তেমন ভাবেই প্রতিটি গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তিবিন্দু আছে, সেই মতো চাপে ও শৈত্যে গ্যাসকে তরলে পরিণত করা যায়। ... পদার্থবিজ্ঞানে যেগুলিকে ধ্রুবক বলা হয় (যে বিন্দুগুলিতে এক অবস্থা থেকে অন্য আর এক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে — স্ট্যালিন) সেগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ক্রান্তিবিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়— এই ক্রান্তিবিন্দুগুলির প্রত্যেকটিতে এসে গতির (অর্থাৎ বিকাশের) পরিমাণগত হ্রাস বা বৃদ্ধি অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বস্তুর মধ্যে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করে এবং তার ফলে পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য গুণগত বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয় (ডায়ালেকটিকস অব নেচার)।

রসায়নশাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন— "পদার্থের উপাদানগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত পরিবর্তনের পরিণামে তার মধ্যে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে,— বলা যায় সেই সম্পর্কিত বিজ্ঞান হল রসায়ন। হেগেলও এই কথাটা জানতেন। যেমন অক্সিজেনের কথা ধরা যাক। সাধারণ ভাবে অক্সিজেনের অণুতে যে দুটি পরমাণু থাকে তার বদলে যদি তিনটি পরমাণু নিয়ে অণুটি গঠিত হয়, তা হলে আমরা পাই ওজোন। এটি এমন একটি পদার্থ যার গন্ধ এবং ক্রিয়া সাধারণ অক্সিজেনের থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথক। তা ছাড়া, যে ভাবে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট অনুপাতে নাইট্রোজেনের অথবা গন্ধকের সঙ্গে অক্সিজেন মিলে বিশেষ বিশেষ যৌগ তৈরি হয়, যাদের প্রত্যেকটি অন্যটি থেকে গুণগত ভাবে পৃথক চরিত্রের— এরই বা কী ব্যাখ্যা দেব আমরা! (পূর্বোক্ত)

যে তিরস্কার হেগেলের প্রাপ্য ছিল, ড্যুরিং তীব্র ভাষায় হেগেলকে সে

তিরস্কার করেছেন কিন্তু অচেতন জড়জগৎ থেকে চেতনাসম্পন্ন জীবজগতের উদ্ভব, অজৈব জগৎ থেকে জীবজগতের উৎপত্তি যে আসলে এক স্তর থেকে লাফ দিয়ে অন্য একটি নতুন স্তরে উত্তরণ— হেগেলের এই সর্বজনবিদিত তত্ত্বটিকে তিনি বেমালুম চুপিসারে আত্মসাৎ করেছেন। এ হেন ড্যুরিংকে সমালোচনা করে এঙ্গেলস লিখেছেন— "পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারের ক্ষেত্রে এইটিই হল হেগেলীয় ক্রান্তিরেখা, এইখানেই এক একটি সুনির্দিষ্ট ক্রান্তিবিন্দুতে পৌঁছে নিছক পরিমাণগত সংযোজন অথবা বিয়োজন লাফ দিয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। যেমন জলের উদাহরণটিই ধরা যাক, জলের স্ফুটনাঙ্ক এবং হিমাঙ্কই এখানে ক্রান্তিবিন্দু। তাপ দিয়ে বা ঠাণ্ডা করে সেই বিন্দুতে পৌঁছলে, স্বাভাবিক চাপে, জল সামগ্রিক ভাবে একটি নতুন অবস্থায় পৌঁছায়, যে ক্ষেত্রে পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়" (অ্যান্টি ডুরিং)।

ঘ) মেটাফিজিক্সের বিপরীতে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব যে মূল উপলব্ধির উপর গড়ে উঠেছে তা হল— প্রকৃতির সকল বস্তু ও ফেনোমেনার ভিতরে রয়েছে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কারণ সব কিছুর ভিতরেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক, পরস্পরবিরোধী দুটি দিক রয়েছে, রয়েছে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ। তার অভ্যন্তরে কিছুর বিনাশ ঘটছে, অন্য কিছুর বিকাশ ঘটছে। এই পরস্পরবিরোধী দিকগুলির দ্বন্দ্ব, পুরনো ও নতুনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মুমূর্ষু ও প্রাণচঞ্চল সদ্যোজাতের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিনাশশীল ও বিকাশশীলের দ্বন্দ্বের মধ্যেই রয়েছে বিকাশপ্রক্রিয়ার অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তনের পথে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের অন্তর্নিহিত সারবস্তু।

তাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে যে, নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে বিকাশের প্রক্রিয়া সংঘাতহীন ক্রমবিকাশ নয়, বরং ফেনোমেনার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ বিরোধের অভিব্যক্তি। এই সমস্ত বিরোধের উপর ভিত্তি করে যে বিপরীত ধারাগুলি সক্রিয় থাকে, সেগুলির "সংঘর্ষের"র ফল। লেনিন বলেছেন— "প্রকৃত প্রস্তাবে, বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যেই যে বিরোধ নিহিত রয়েছে, তাকে জানাই দ্বন্দ্বতত্ত্ব (ফিলজফিক্যাল নোট বুকস)। তিনি আরও বলেছেন— "বিপরীতের 'সংঘর্ষই' হল বিকাশ" (অন দ্য কোয়েশ্চেন অব ডায়ালেকটিকস)। সংক্ষেপে, এগুলিই হল মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য।

কাজেই সামাজিক জীবন ও সমাজের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে বোঝার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মূল নীতিগুলির প্রয়োগের যে কী বিরাট গুরুত্ব, তা সহজেই বোঝা যায়। এ-ও বোঝা কঠিন নয় যে, সমাজের ইতিহাস ও সর্বহারা পার্টির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির প্রয়োগ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

তা হলে বিশ্বপ্রকৃতিতে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন কোনও ফেনোমেনার অস্তিত্ব যে হেতু নেই, সকল ফেনোমেনা যে হেতু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, একে অপরকে প্রভাবিত করে, তাই এ-ও পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইতিহাসে কোনও সমাজব্যবস্থা, কোনও সামাজিক আন্দোলনকেই কোনও এক "শাশ্বত ন্যায়বিচার" বা ওই ধরনের পূর্বনির্ধারিত কোনও মাপকাঠিতে বিচার করা চলে না। যা বহু ইতিহাসবিদই করে থাকেন। বরং যে অবস্থা ওই সমাজব্যবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, যার সঙ্গে ওই সমাজব্যবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনটি যুক্ত, সেই পটভূমিতেই তার বিচার করতে হবে।

বর্তমান যুগের পটভূমিতে বিচার করলে, দাসপ্রথাকে বুদ্ধিহীন মূর্খামি এবং অস্বাভাবিক বলেই মনে হবে। কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ভেঙে যাচ্ছিল, সেই অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মেই যে দাসপ্রথার উদ্ভব ঘটেছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের তুলনায় দাসপ্রথা ছিল অগ্রগতির পথে একটি পদক্ষেপ।

যেমন ধরা যাক, ১৯০৫ সালে রাশিয়ায়, যখন জারতন্ত্র ক্ষমতায় রয়েছে ও বুর্জোয়া ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সেই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি যে যুক্তিসঙ্গত, সঠিক ও বিপ্লবী দাবি তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ সেই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ সামনের দিকে এক পা বাড়ানো। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন প্রতিষ্ঠিত, সেই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং প্রতিবিপ্লবী দাবি, কারণ সোভিয়েট রিপাবলিকের সঙ্গে তুলনায় বুর্জোয়া রিপাবলিক হল এক পা পিছু হাঁটা।

সবকিছুই স্থান, কাল এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

এ-ও খুব পরিষ্কার যে, সামাজিক ঘটনাবলি সম্পর্কে এ ধরনের ইতিহাসসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে, ইতিহাস সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণার অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইতিহাসকে কতকগুলি বিশৃঙ্খল ঘটনার সমষ্টিতে এবং এক গুচ্ছ উৎকট ভ্রান্তিতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

তা ছাড়া বিশ্বপ্রকৃতি অবিরাম গতি ও বিকাশের মধ্যে দিয়েই যখন চলেছে, পুরাতনের বিনাশ ও নবীনের আবির্ভাবই যে হেতু বিকাশের নিয়ম, তাই কোনও সমাজব্যবস্থাই "অপরিবর্তনীয়" হতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণের পিছনে কোনও "শাশ্বত নীতি", জমিদারের কাছে কৃষকের, পুঁজিপতির কাছে শ্রমিকের পদানত থাকার পিছনে কোনও "শাশ্বত ভাবধারা" থাকতে পারে না।

অর্থাৎ, এক দিন যেমন বিকাশের যুগে পুঁজিবাদ সামন্তী সমাজের স্থান দখল করেছিল, তেমনই পুঁজিবাদী সমাজের জায়গায় আসবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

সুতরাং বর্তমান মুহূর্তে প্রধান সামাজিক শক্তি হিসাবে অবস্থান করলেও সমাজের যে অংশের আর বিকাশ ঘটছে না, তার স্বার্থ অনুযায়ী আমাদের নিজেদের গড়ে তোলা উচিত নয়, বরং বর্তমান মুহূর্তে প্রধান শক্তি হিসাবে অবস্থান না করলেও, সমাজের যে অংশটি বিকাশশীল তার স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়েই নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

বিগত শতাব্দীর আটের দশকে, নারদনিকদের সঙ্গে মার্ক্সবাদীদের সংগ্রামের পর্যায়ে, রাশিয়ার জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল ছোটবড় চাষি, তুলনামূলক ভাবে প্রলেতারিয়েতরা ছিল সংখ্যায় প্রায় নগণ্য। কিন্তু শ্রেণি হিসাবে প্রলেতারিয়েত ছিল বিকাশশীল, আর শ্রেণি অর্থে কৃষকরা ভাঙছিল। যে হেতু প্রলেতারিয়েতরাই শ্রেণি হিসাবে বিকাশের পর্যায়ে ছিল, ঠিক সেই জন্যই মার্ক্সবাদীরা নিজেদের প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ অনুযায়ী গড়ে তুলেছিল। তারা ভুল করেনি। কারণ, আমরা জানি, পরবর্তীকালে এই সর্বহারা শ্রেণিই বিকাশের পথে নগণ্য শক্তি থেকে সবচেয়ে অগ্রণী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

অর্থাৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি ভুল করতে না চাই তবে সামনের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে, পিছন দিকে নয়।

তা ছাড়া, ধীর পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে দ্রুত ও হঠাৎ গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ যে হেতু বিকাশের নিয়ম, তাই এ-ও পরিষ্কার যে, যুগে যুগে শোষিত শ্রেণির বিপ্লবী অভ্যুত্থানও স্বাভাবিক এবং অনিবার্য।

এ থেকে আরও যা বেরিয়ে আসে তা হল— পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, পুঁজিবাদী শোষণ-নির্যাতন থেকে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি অর্জন, ধীর পরিবর্তন বা সংস্কারের পথে হতে পারে না। পুঁজিবাদী সমাজের গুণগত পরিবর্তনের দ্বারা অর্থাৎ বিপ্লবের পথেই সমাজতন্ত্রে পৌঁছান সম্ভব। অর্থাৎ নীতিগত ক্ষেত্রে যদি ভুলের হাত থেকে বাঁচতে হয় তবে সংস্কারবাদী নয়, আমাদের বিপ্লবী হতে হবে।

আরও দেখা যাচ্ছে, যে হেতু বিকাশের ধারা হল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ, এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সেই দ্বন্দ্বের নিরসনের প্রক্রিয়াই হল বিকাশ, তাই প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিসংগ্রামও পুরোপুরি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ঘটনা।

সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে আড়াল করা নয়, তাকে

উদঘাটিত করে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের কাজ, শ্রেণিসংগ্রামকে প্রশমিত করা নয়, তাকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য।

অতএব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভ্রান্ত থাকতে হলে, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সমন্বয়ের নীতি অর্থাৎ সংস্কারবাদী নীতি নিয়ে চললে হবে না, বিকাশের পথে পুঁজিবাদ 'আপন নিয়মেই' সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে— এ রকম আপসমুখী নীতিকে বর্জন করতে হবে। আমাদের অবশ্যই আপসহীন ভাবে সর্বহারা শ্রেণির রাজনীতি অনুসরণ করতে হবে।

এই হল সমাজজীবনে ও সমাজের ইতিহাসে মার্ক্সবাদী দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মূল কথা।

মার্ক্সবাদী দর্শন বা বস্তুবাদ মৌলিক ভাবে ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২) মার্ক্সবাদী দার্শনিক বস্তুবাদ

মার্ক্সবাদী দার্শনিক বস্তুবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই রকম—

ক) মার্ক্সবাদের বিপরীতে ভাববাদ মনে করে বিশ্বপ্রকৃতি হল এক 'পরম ভাব' বা 'সর্বত্র বিরাজমান' 'আত্মা বা চেতনা'রই মূর্ত প্রকাশ। আর মার্ক্সের দার্শনিক বস্তুবাদের মূল কথা ঃ বিশ্বজগতের বৈশিষ্ট্যই হল তা বস্তুময়। তার বহুবিচিত্র প্রকাশ হল গতিশীল বস্তুরই নানা রূপ। দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফেনোমেনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরশীলতা হল গতিশীল বস্তুর বিকাশেরই একটি নিয়ম এবং বস্তুর গতির নিয়ম অনুযায়ীই এই বিশ্বজগতের বিকাশ ঘটছে, এর জন্য কোনও 'সর্বভূতে বিরাজমান পরম চৈতন্যের' প্রয়োজন পড়ে না।

এঙ্গেলস বলেছেন— "বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি মানে— প্রকৃতি যে ভাবে আছে, তাকে ঠিক সে ভাবেই বোঝা, বস্তুবহির্ভূত কোনও ধারণা দিয়ে বোঝা নয়" (ডায়ালেকটিকস অব নেচার)।

প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেছিলেন— সকল বস্তুর সমবায়ে গঠিত এই বিশ্বপ্রকৃতি কোনও ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, কোনও মানুষও একে গড়েনি প্রকৃতিজগৎ চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। এ যেন শাশ্বত এক অগ্নিশিখা যা স্বাভাবিক নিয়মেই কখনও নেভে আবার নিয়ম মেনেই জ্বলে ওঠে। তাঁর এই বস্তুবাদী বক্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন— "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আদি ও অপরিস্ফূট রূপের এ এক চমৎকার নিদর্শন" (ফিলজফিক্যাল নোটবুকস)।

খ) ভাববাদ বলে, কেবলমাত্র আমাদের চেতনা হল বাস্তব, বস্তুজগৎ, বস্তুসত্তার অস্তিত্ব, প্রকৃতির অস্তিত্ব সব কিছুই আমাদের চৈতন্যের উপর,

আমাদের অনুভূতি, ভাবনা ও উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। ভাববাদের বিপরীতে মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দর্শন বলে পদার্থ, প্রকৃতি, বস্তুসত্তা হল চেতনানিরপেক্ষ বাস্তব, আমাদের চৈতন্যের বাইরে এর স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। মার্ক্সীয় বস্তুবাদে বলা হয়, বস্তুই আদি ও মূল, কারণ তা হল অনুভূতি, ভাবনা ও চৈতন্যের উৎস। এ সবই বস্তুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। চেতনা হল গৌণ, এর সৃষ্টি বস্তু থেকে, কারণ চেতনা বস্তুরই প্রতিফলন, বাস্তব ও চেতনানিরপেক্ষ বস্তুজগতেরই প্রতিফলন। চিন্তার উৎপত্তিও বস্তু থেকে, যে বস্তু বিকাশের পথে মানুষের মস্তিষ্কের মতো এক অত্যন্ত উন্নত নিখুঁত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এই মস্তিষ্ক হল চিন্তা করার অঙ্গ। তাই চিন্তাকে বস্তু থেকে পৃথক করা চলে না, করলে তা হবে মারাত্মক ভুল। এঙ্গেলস বলেছেন—

"চিন্তার সঙ্গে বস্তুসত্তার, চৈতন্যের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কী? এইটিই দর্শনের মূল প্রশ্ন। ... এই প্রশ্নের উত্তর কে কী ভাবে দিয়েছেন তার ভিত্তিতে দার্শনিকদের দুটি প্রধান শিবিরে ভাগ করা হয়। যাঁরা মনে করেন বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভবেরও আগে চৈতন্যের অস্তিত্ব ছিল, ... তাঁরা হলেন ভাববাদী। আর যাঁরা বস্তুজগতকেই সব কিছুর ভিত্তি, বস্তুকেই আদি বলে মনে করেন, চিন্তাধারার নানা পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই বস্তুবাদী।"

তিনি আরও বলেছেন— "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই যে বস্তুজগতের মধ্যে আমরা রয়েছি, এইটিই একমাত্র বাস্তব। ... আমাদের চৈতন্য ও চিন্তাক্ষমতাকে যতই ইন্দ্রিয়াতীত বলে মনে হোক না কেন, তা বস্তু দিয়ে গঠিত আমাদের দেহেরই একটি অঙ্গ, মস্তিষ্কের সৃষ্টি। ভাব থেকে বস্তু সৃষ্টি হয়নি, বরং ভাব হল বস্তুর সর্বোন্নত সৃষ্টি।"

বস্তু ও চিন্তা সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স বলেছেন— "বস্তুই চিন্তা করে। তাই বস্তু থেকে চিন্তাকে আলাদা করা যায় না। সকল পরিবর্তনের মূলে আছে বস্তু।"

বস্তুবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে লেনিন বলেছেন— "বস্তুবাদ সমস্ত দিক থেকেই বাস্তব সত্তা, অর্থাৎ বস্তুর অনুভূতি, অভিজ্ঞতা আর চেতনানিরপেক্ষ অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়। ... চেতনা হল বস্তুরই প্রতিফলন, খুব নিখুঁত হলে, তা বস্তুর মোটামুটি নির্ভরযোগ্য (যথাযথ ও সম্পূর্ণ সঠিক) প্রতিফলন (মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড ইম্পিরিও ক্রিটিসিজম)।

লেনিন আরও বলেছেন— " আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির উপর ক্রিয়া করে যা অনুভূতির সৃষ্টি করে, তা-ই বস্তু। বস্তু একটি বিদ্যমান বাস্তব, যাকে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। বস্তু, বিশ্বপ্রকৃতি, জৈব ও অজৈব পদার্থের অস্তিত্বই হল আদি, মুখ্য এবং অনুভূতি, চৈতন্য, মানসিকতা— এ সবই

গৌণ, বস্তু থেকেই তা গড়ে উঠেছে'' (পূর্বোক্ত)।

"যে ভাবে বস্তু গতির মধ্য দিয়ে চলেছে, যে ভাবে বস্তু চিন্তা করছে— তাই বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃত রূপ'' (পূর্বোক্ত)। "মস্তিষ্কই হল সেই অঙ্গ যা দিয়ে আমরা চিন্তা করি'' (পূর্বোক্ত)।

গ) ভাববাদ মনে করে বিশ্বপ্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে জানা সম্ভব নয়। আমাদের জ্ঞান যে সঠিক হতে পারে এ বিশ্বাস তার নেই, চেতনানিরপেক্ষ বাস্তব সত্যকে সে স্বীকার করে না। ভাববাদ মনে করে সমস্ত বস্তুজগৎ এমন কিছু অজ্ঞেয় সত্তায় পূর্ণ (things-in-themselves) যাকে বিজ্ঞান কোনও দিনই জানতে পারবে না, জানা সম্ভবই নয়। এর বিপরীতে, মার্ক্সীয় দার্শনিক বস্তুবাদের গোড়ার কথা হল বিশ্বপ্রকৃতি ও তার নিয়মকানুনগুলিকে জানা পুরোপুরি সম্ভব। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকানুন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, যা অভিজ্ঞতা ও হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যায়, তা নির্ভরযোগ্য, বাস্তব সত্য। জগতে অজ্ঞেয় বলে কিছু নেই, তবে অজানা অনেক কিছু আছে, যা ভবিষ্যতে আমরা বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত ও আয়ত্ত করতে পারব।

'বিশ্বপ্রকৃতি অজ্ঞেয় এবং চিরঅজ্ঞেয় সত্তায় (things-in-themselves) পূর্ণ'— কান্ট প্রমুখ ভাববাদীদের এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে এবং 'বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যে যথার্থ' বস্তুবাদের এই মূল নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে এঙ্গেলস লিখেছেন— "এই সব দার্শনিক বাতুলতার অকাট্য জবাব এসেছে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে, বিশেষ করে হাতে কলমে পরীক্ষা ও কলকারখানায় প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। যদি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে বস্তুজগতের কোন প্রক্রিয়াকে আমরা সৃষ্টি করতে ও কাজে লাগাতে পারার দ্বারা প্রাকৃতিক কোনও ঘটনা সম্পর্কে আমাদের ধারণার যাথার্থ্য প্রমাণ করতে পারি, তা হলেই কান্ট কথিত বস্তুর চিরঅজ্ঞেয়তার (thing-in-itself) তত্ত্ব খতম হয়ে যায়। গাছপালা ও জীবদেহের জৈবপদার্থ যত দিন তৈরি করা যায়নি তত দিন এগুলি চিরঅজ্ঞেয় বস্তুর (thing-in-itself) মধ্যে ছিল, কিন্তু যখন জৈব রসায়নবিজ্ঞান একের পর এক জৈব পদার্থ তৈরি করে ফেলল তখন এগুলি আমাদের জানা অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুতে (things for us) পরিণত হল। যেমন ধরা যাক আলিজারিন, এটা মাদার গাছের রঞ্জকবস্তু। কিন্তু আজকাল আমরা মাদার গাছ পুঁতে তা থেকে এই রঙ জোগাড় করি না, বরং অনেক সস্তায় ও সহজে আলকাতরা থেকে ওই জিনিস তৈরি করে নিই। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব বিগত তিনশো বছর ধরে একটা প্রকল্প (hypothesis) হিসাবেই ছিল। অত্যন্ত উন্নত মানের প্রকল্প ছিল বটে তবুও তা ছিল প্রকল্পই। কিন্তু যখন এই প্রকল্পের ভিত্তিতে লেভেরিয়ে শুধু

একটা অজানা গ্রহের অবিসংবাদী অস্তিত্বের কথাই বললেন না, হিসাব করে নিশ্চিত ভাবেই সৌরমণ্ডলে তার অবস্থানও নিরূপণ করলেন এবং গ্যাল যখন সত্যিই সেই গ্রহকে খুঁজে বের করলেন তখন কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সত্য বলে প্রমাণিত হল। (লুডভিগ ফয়ারবাখ অ্যান্ড দ্য এন্ড অব জার্মান ক্লাসিকাল ফিলজফি।

বোগদানফ, বাজারফ, য়ুশকেভিচসহ মাখের অন্যান্য শিষ্যদের ফাইডেইজমের (Fideism — জ্ঞানের বদলে অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করার মতবাদ) অনুসারী বলে সমালোচনা করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞানসম্মত ধারণাগুলি যে নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিয়মগুলি যে সত্য— বস্তুবাদী দর্শনের এই মূল সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে লেনিন বলেছেন—

"আধুনিক ফাইডেইজম বিজ্ঞানকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে না, কেবল বিজ্ঞানের 'মাত্রাতিরিক্ত দাবিকে', বিশেষ করে সত্য যে চেতনানিরপেক্ষ বাস্তব, এই দাবিকে অস্বীকার করে। সত্যের অবস্থান যে হেতু বাস্তব (বস্তুবাদীরা যেমন মনে করে), বিশ্বপ্রকৃতিকে মানুষের অভিজ্ঞতার দর্পণে প্রতিফলিত করার দ্বারা একমাত্র প্রকৃতিবিজ্ঞানই যেহেতু আমাদের সত্যে পৌঁছে দিতে পারে, তাই সব ধরনের ফাইডেইজম পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়" (মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড ইম্পিরিও ক্রিটিসিজম)।

অল্প কথায়, এগুলিই হল মার্ক্সীয় দার্শনিক বস্তুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কাজেই সামাজিক জীবন ও সমাজের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে বোঝার ক্ষেত্রে দার্শনিক বস্তুবাদের মূলনীতিগুলির প্রয়োগের যে কী বিরাট গুরুত্ব, তা সহজেই বোঝা যায়। এ-ও বোঝা কঠিন নয় যে, সমাজের ইতিহাস ও সর্বহারা পার্টির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির প্রয়োগ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যে হেতু বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশের নিয়ম, তাই সমাজজীবনের ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরশীলতাও সমাজবিকাশের নিয়ম— এগুলি আকস্মিক কিছু নয়।

অতএব সমাজজীবন, সমাজের ইতিহাস কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার সমষ্টি নয়, বরং দেখা যাচ্ছে সমাজের ইতিহাস হল নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজবিকাশের ইতিহাস। ফলে সমাজবিকাশের ইতিহাস অনুশীলনও একটি সার্থক বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং একটা সর্বহারার পার্টি তার কর্মধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনও 'মহাপুরুষে'র সদিচ্ছার উপর, নিছক 'মুক্তবুদ্ধি'র বা 'সার্বজনীন নৈতিকতা'র

উপর নির্ভর করতে পারে না। সর্বহারার পার্টি সমাজবিকাশের নিয়মগুলির উপর, সেই নিয়মগুলি অনুধাবনের উপর নির্ভর করে।

সেই সঙ্গে বলতে হবে, বিশ্বজগতকে জানা সম্ভব এবং প্রকৃতির বিকাশের নিয়মগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রামাণ্য ও বাস্তব সত্য— এ কথা যে হেতু ঠিক তাই এ-ও ঠিক যে, সামাজিক জীবন ও সমাজবিকাশের নিয়মগুলিও জানা সম্ভব এবং সমাজবিকাশের যে নিয়মগুলি বিজ্ঞান তুলে ধরে তাও প্রামাণ্য এবং বাস্তব সত্য।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, সমাজজীবনের নানা ঘটনা ও বিষয়গুলির যত জটিলতাই থাক, সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণের বিজ্ঞানও, বিজ্ঞানের অন্য যে কোনও শাখা, যেমন ধরা যাক, জীববিজ্ঞানের মতোই, একটি যথার্থ বিজ্ঞান হতে পারে এবং সমাজবিকাশের নিয়মগুলি বাস্তবে কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করা যায়।

এ জন্যই, নিছক দৈনন্দিন আশু লক্ষ্যকে সামনে রেখে সর্বহারা শ্রেণির পার্টির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা উচিত নয়, তাদের উচিত সমাজবিকাশের বাস্তব নিয়ম এবং সেই নিয়মগুলির যথার্থ উপলব্ধির ভিত্তিতেই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

এ ভাবেই সমাজতন্ত্রের ভাবনা, যা এক দিন মানবসমাজের জন্য উন্নততর ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন হিসাবে ছিল, তা আজ একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে।

এই ভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব কর্মকাণ্ডের অচ্ছেদ্যবন্ধন, তত্ত্বের সঙ্গে কর্মের মিলন এবং উভয়কে অখণ্ড রূপে মেলানোই হল সেই ধ্রুবতারা, যা সর্বহারা শ্রেণির দলকে পথ দেখায়।

তা ছাড়া প্রকৃতি, অর্থাৎ বস্তুজগত যে হেতু মুখ্য বা বনিয়াদ এবং চেতনা, চিন্তা যে হেতু তা থেকে গড়ে ওঠে, বস্তুজগত যে হেতু মানুষের চেতনা নিরপেক্ষ বাস্তব এবং চেতনা যে হেতু সেই বাস্তবের প্রতিফলন, তাই এ কথা বলতেই হবে যে, বাস্তব সমাজজীবন, তার বাস্তব অস্তিত্বই হল ভিত্তি এবং তা থেকে, তারই উপর গড়ে ওঠে ভাবজগত। সমাজজীবন মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবে বাস্তবে অবস্থান করে, সমাজের ভাবগত জীবন হল সেই বাস্তব সামাজিক জীবন ও তার অস্তিত্বেরই প্রতিফলন।

কাজেই, সমাজের ভাবগত জীবন, সামাজিক ভাবধারা, সামাজিক নানা তত্ত্ব, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান— এ সবের উৎস ওই সব ভাবধারা, তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তা খুঁজতে হবে বাস্তব সমাজজীবন কী অবস্থায় আছে তার মধ্যে, সমাজের অস্তিত্বের মধ্যে। কারণ এদেরই প্রতিফলন হিসাবে গড়ে ওঠে ধ্যানধারণা, তত্ত্ব,

দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

অতএব সমাজবিকাশের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যে হেতু বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ভাবধারা, তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়, যে হেতু দাসসমাজে বিশেষ এক ধরনের সামাজিক ভাবধারা, তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়, সামন্ততন্ত্রে পাওয়া যায় ভিন্ন ধরনের, পুঁজিবাদে আবার তৃতীয় এক ধরনের পাওয়া যায়, তাই বুঝতে হবে, এই সব ভাবধারা, তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে এগুলির 'প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য' বা 'নিজস্ব প্রকৃতি'র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজজীবনের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে এই ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে।

একটা সমাজের বাস্তব অবস্থা যেমন, তার বাস্তব সমাজজীবন যে পরিস্থিতিতে রয়েছে, সেই অনুযায়ীই একটি সমাজের ভাবধারা, তত্ত্ব, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্স বলেছেন— "মানুষের চৈতন্য তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং তার সামাজিক অস্তিত্ব তার চৈতন্যকে নির্ধারণ করে" (এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি, মুখবন্ধ)।

অর্থাৎ নীতিগতক্ষেত্রে ভুলের হাত থেকে বাঁচতে হলে, নিছক কল্পনাবিলাসীর দশা এড়াতে হলে, সর্বহারা শ্রেণির পার্টির উচিত— সমাজবিকাশের নিয়ামক শক্তি হিসাবে বাস্তববিচ্ছিন্ন কোনও "মানবিক যুক্তির নীতি"র বদলে সমাজজীবনের বিশেষ বস্তুগত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, কোনও "মহাপুরুষের" সদিচ্ছার বদলে বাস্তব সমাজজীবনের বিকাশের যথার্থ প্রয়োজনের উপরে ভিত্তি করে, তার কার্যকলাপ চালানো।

নারদনিক, নৈরাজ্যবাদী, সোসালিস্ট রেভলিউশনারি প্রমুখ কল্পনাবিহারীদের পতন এটাই দেখিয়ে দেয় যে, সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে সমাজজীবনের বাস্তব পরিস্থিতিই যে প্রধান ভূমিকা পালন করে— এটা তারা স্বীকার করেনি। ভাববাদের খপ্পরে পড়ে, তারা তাদের বাস্তব কর্মধারা, সমাজজীবনের বিকাশের যথার্থ প্রয়োজনকে বুঝে, তার ভিত্তিতে নির্ধারণ করেনি।

বরং বাস্তব সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি "বিমূর্ত পরিকল্পনা" বা "সার্বিক প্রকল্পের" উপর নির্ভর করেই তাদের কর্মধারা নির্ধারণ করেছে।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সমাজের বাস্তব জীবনধারা থেকে কখনওই বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং তা বিশেষ ভাবে সমাজজীবনের বিকাশের বাস্তব প্রয়োজনের উপরেই গড়ে ওঠে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রাণ, তার শক্তি এইখানেই নিহিত।

অবশ্যই মার্ক্সের উক্তি থেকে এটা বোঝায় না যে, সামাজিক ভাবধারা, তত্ত্ব, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিষ্ঠানগুলির সমাজজীবনে কোনও গুরুত্ব নেই, বা এইগুলি সামাজিক জীবনধারা, সমাজজীবনের বাস্তব পরিস্থিতির বিকাশের উপর কোনও প্রভাব ফেলে না। বরং সামাজিক ভাবধারা, তত্ত্ব, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিষ্ঠানগুলি কী ভাবে গড়ে ওঠে, এগুলির উৎস কী, এতক্ষণ আমরা কেবল এইটিই আলোচনা করেছি ও দেখিয়েছি যে, সমাজের ভাবগত জীবন তার বস্তুগত জীবনের প্রতিফলন হিসাবেই গড়ে ওঠে। সামাজিক ভাবধারা, তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলির তাৎপর্য, ইতিহাসে এগুলির ভূমিকাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অস্বীকার তো করেই না বরং সমাজজীবনের উপর, সমাজের ইতিহাসে এগুলির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ও ভূমিকার উপর বিশেষ ভাবে জোর দেয়।

বহু ধরনের সামাজিক ভাবধারা ও তত্ত্বের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই। কিছু ভাবধারা ও তত্ত্ব হল পুরনো, ইতিহাসে যেগুলির দিন ফুরিয়ে গিয়েছে এবং বর্তমানে যেগুলি সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিগুলির স্বার্থরক্ষা করছে। সমাজের বুকে এদের ভূমিকা হল— এরা সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। আবার রয়েছে নবীন ও অগ্রণী ভাবধারা ও তত্ত্ব, যা সমাজের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সাহায্য করছে। এই সব অগ্রণী ভাবধারা ও তত্ত্ব সমাজের বিকাশকে, তার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে— এখানেই এগুলির তাৎপর্য নিহিত। বাস্তব সমাজজীবনের বিকাশের প্রয়োজনকে এগুলি যত নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত করে এগুলির সার্থকতাও সেই মতো বাড়ে।

সমাজে বাস্তব জীবনের উন্নতির ফলে যখন সমাজের সামনে নতুন সমস্যা ও কর্তব্য দেখা দেয়, একমাত্র তারপরই নতুন সামাজিক ভাবধারা ও তত্ত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু একবার গড়ে ওঠার পর এগুলি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়, যে শক্তি বাস্তব সামাজিক জীবনের উন্নততর স্তরে দেখা দেওয়া নতুন সমস্যাগুলির সমাধান ত্বরান্বিত করে, সমাজের অগ্রগতির পথকে সুগম করে। ঠিক এই প্রশ্নেই ফুটে ওঠে সংগঠিত করার, গতিবেগ সঞ্চার করার ও পরিবর্তন সাধিত করার ক্ষেত্রে নবীন ভাবধারা, নতুন তত্ত্ব, নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিষ্ঠানের মূল্য কতখানি। নবীন ভাবধারা, নতুন তত্ত্ব যে হেতু সমাজের প্রয়োজন থেকেই গড়ে ওঠে তাই সমাজের পক্ষে তা অপরিহার্য। নবীন ভাবধারার সাংগঠনিক, পরিবর্তন-সহায়ক, সংহতি সৃষ্টিকারী ভূমিকা ছাড়া উন্নততর জীবন গড়ে তোলার পথের গুরুত্বপূর্ণ মূল সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয়। সমাজের বস্তুগত জীবনধারার বিকাশের পথে দেখা দেওয়া নতুন সমস্যা ও

নতুন কর্তব্যের বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠার ফলে নবীন সামাজিক ভাবধারা ও তত্ত্ব নিজেদের পথ নিজেরাই করে নেয়, জনগণের সম্পদে পরিণত হয়, জনগণের শক্তিকে সংহত করে, সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিগুলির মোকাবিলায় জনগণকে সংগঠিত করে এবং এই ভাবে, যে সব ক্ষয়িষ্ণু শক্তি বাস্তব সামাজিক জীবনের অগ্রগতির পথে বাধা সেগুলির উচ্ছেদ ঘটাতে সাহায্য করে।

এই ভাবে, সামাজিক জীবনের অগ্রগতি, সমাজের বস্তুগত জীবনের বিকাশের জরুরি প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে যে সামাজিক ভাবধারা, তত্ত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠার পর সেগুলিই আবার সামাজিক জীবনধারা, বাস্তব সামাজিক জীবনের উপর ক্রিয়া করে এবং তার দ্বারা বাস্তব সমাজজীবনের জরুরি প্রয়োজনগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, আরও অগ্রগতির পথ খুলে দেয়।

এ প্রসঙ্গে মার্ক্স বলেছেন, "জনগণ যখন একটা তত্ত্বকে গ্রহণ করে তখনই সেই তত্ত্ব, একটা বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়" (ক্রিটিক অব দি হেগেলস ফিলজফি অব রাইট)।

সুতরাং, বাস্তব সমাজজীবনের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে হলে, তার অগ্রগতি ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে হলে, তার উন্নতি ঘটাতে হলে সর্বহারা শ্রেণির দলকে এমন একটা সামাজিক তত্ত্ব গ্রহণ করতে হয়, যে তত্ত্ব বাস্তব সমাজজীবনের বিকাশের প্রয়োজনগুলিকে সঠিক ভাবে প্রতিফলিত করে এবং তার ফলে তা সমাজের ব্যাপক অংশের জনগণকে সক্রিয় করে, তাদের উজ্জীবিত করতে পারে এবং তাদের সর্বহারার দলের সেনানী হিসাবে সংগঠিত করতে পারে— যাতে তারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে চূর্ণ করে, সমাজের আগুয়ান শক্তিগুলির চলার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। অর্থনীতিবাদের প্রবক্তাদের ও মেনশেভিকদের পতনের নানা কারণের একটি এই যে, তারা সংগঠিত করার, উজ্জীবিত করার ও পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী তত্ত্ব, অগ্রণী ভাবধারার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয়নি। ভালগার বস্তুবাদের* কবলে পড়ে তত্ত্ব ও ভাবধারার ভূমিকাকে তারা শূন্যের কোঠায় ঠেলে দিয়েছে, ফলত পার্টিকে তারা নিষ্ক্রিয় জড়ভরতে পরিণত করেছে।

অগ্রগামী তত্ত্বের উপর নির্ভরতাই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রাণসত্তা, তার শক্তির উৎস, যে তত্ত্ব সমাজজীবনের বাস্তব প্রয়োজনকে সঠিক ভাবে প্রতিফলিত করে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বকে সর্বোন্নত স্তরে নিয়ে যায়। শক্তি

* জড়বাদ, অসম্পূর্ণ বিকৃত বস্তুবাদ যা মানুষের চেতনার ভূমিকাকে স্বীকার করে না। নৈতিকতাকে মূল্য দেয় না।

সমাবেশ ঘটানোর ক্ষমতা, সাংগঠনিক শক্তি ও সমাজপরিবর্তনের ক্ষেত্রে তত্ত্বের ভূমিকাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো অবশ্যকর্তব্য মনে করে।

বাস্তব সমাজজীবন এবং সমাজসচেতনতা বা বস্তুগত জীবনের বিকাশ এবং ভাবগত জীবনের বিকাশ এ সবের মধ্যে সম্পর্ক কী— এই সব প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই ভাবে তুলে ধরে।

৩। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

এখন যে বিষয়টির আলোচনা বাকি রয়েছে তা হল— সামাজিক জীবনের বস্তুগত পরিবেশ, যা চূড়ান্ত বিচারে সমাজের গঠন, তার ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চরিত্র নির্ধারণ করে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সামাজিক জীবনের বস্তুগত পরিবেশ বলতে কী বোঝায়।

"সামাজিক জীবনের বস্তুগত পরিবেশ" বলতে ঠিক কোন জিনিসকে বোঝায়, সেগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "সামাজিক জীবনের বস্তুগত পরিবেশ" বলতে যা বোঝায়, তার মধ্যে প্রথমেই পড়ে প্রকৃতিজগৎ, যা সমাজকে ঘিরে থাকে। আর পড়ে ভৌগোলিক পরিবেশ, যা বাস্তব সামাজিক জীবনে সদাবিরাজমান ও অপরিহার্য উপাদান এবং যা অবশ্যই সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ কোন ভূমিকা পালন করে? সমাজের গড়ন, সমাজব্যবস্থার চরিত্র এবং এক ধরনের সমাজ থেকে ভিন্ন ধরনের সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ নির্ণায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে— "না"। এ কথা অনস্বীকার্য যে, যে সব সদাবিরাজমান অপরিহার্য উপাদান সমাজের বিকাশকে প্রভাবিত করে, বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত অথবা স্তিমিত করে, ভৌগোলিক পরিবেশ তার মধ্যে একটা। কিন্তু তার এই ভূমিকা নির্ণায়কের ভূমিকা নয়। কারণ সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশের গতি এত দ্রুত যে তার সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবর্তন ও বিকাশের গতির কোনও তুলনাই চলে না। বিগত তিন হাজার বছরের মধ্যে ইউরোপে ক্রমান্বয়ে তিন রকম সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, দাসসভ্যতা ও সামন্তী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটেছে। পূর্ব ইউরোপে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে এমনকি চারটি সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের ভৌগোলিক পরিবেশ হয় একেবারেই বদলায়নি, নয়ত এত সামান্য বদলেছে যে, ভূগোলবিদ্যা তাকে আমলই দেয় না,

এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক পরিবর্তন হতে কোটি কোটি বছর লাগে। অন্য দিকে মানুষের সমাজব্যবস্থায় খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকশো বা বড়জোর দু-এক হাজার বছরই যথেষ্ট।

ফলে বোঝাই যাচ্ছে যে, ভৌগোলিক পরিবেশ সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান কারণ বা নির্ণায়ক কারণ হতে পারে না। কারণ হাজার হাজার লাখ লাখ বছর ধরে যা অপরিবর্তিত থাকে— তা কখনওই এমন কোনও বিকাশের প্রধান কারণ হতে পারে না, যা কয়েকশো বছরের মধ্যে আমূল ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এ-ও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "সামাজিক জীবনের বস্তুগত পরিবেশ" বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন মাত্রায় জনবসতির ঘনত্বের প্রশ্নটিও রয়েছে। কারণ বাস্তব সামাজিক জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান মানুষ। ন্যূনতম একটা জনসংখ্যা ছাড়া বাস্তব সামাজিক জীবনই সম্ভব নয়। তা হলে প্রশ্ন ওঠে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিই কি সমাজব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণে প্রধান শক্তির ভূমিকা নেয়?

এ ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে— "না"।

অবশ্যই জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমাজের বিকাশকে প্রভাবিত করে, সমাজের বিকাশের গতিকে দ্রুততর বা ধীর করতে সহায়তা করে, কিন্তু তা সমাজের বিকাশে মূল শক্তি নয় এবং সমাজবিকাশে এর প্রভাব নির্ণায়কের ভূমিকা নিতে পারে না। কারণ একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে বিশেষ একটা নতুন সমাজব্যবস্থা আসে কেন? অন্য কোনও ব্যবস্থা আসে না কেন? কেন আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের পরেই দাসব্যবস্থা এসেছে, দাসব্যবস্থার পর এসেছে সামন্ততন্ত্র? কেন সামন্ততন্ত্রের পরে বুর্জোয়া ব্যবস্থাই এসেছে অন্য কোনও ব্যবস্থা আসেনি?— জনসংখ্যা বৃদ্ধি দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না।

যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমাজবিকাশের নিয়ন্তা হত, তা হলে, যেখানে জনবসতি যত বেশি ঘন, সেখানে তত উন্নততর সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। চিনের জনসংখ্যার ঘনত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারগুণ, অথচ সামাজিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। চিনে আজও আধা সামন্তী ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে আমেরিকা দীর্ঘদিন আগেই পুঁজিবাদী বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। বেলজিয়ামে জনবসতির ঘনত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় উনিশগুণ, সোভিয়েট ইউনিয়নের তুলনায় ছাব্বিশগুণ বেশি। অথচ সামাজিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে আমেরিকার স্থান

বেলজিয়ামের ওপরে। আর সোভিয়েট ইউনিয়নের তুলনায় বেলজিয়ামের সমাজব্যবস্থা পুরো একটি ঐতিহাসিক স্তর পিছিয়ে আছে। বেলজিয়ামে আজও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে, যেখানে সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটে গিয়ে গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি নয়, তা সমাজের গড়ন, সমাজব্যবস্থার চরিত্রের নির্ণায়ক শক্তি নয়, হতেও পারে না।

ক) তা হলে প্রশ্ন হল, সামাজিক জীবনের জটিল বস্তুগত পরিবেশের মধ্যে কোন সে শক্তি, যা সমাজের গড়ন, সমাজব্যবস্থার চরিত্র এবং এক ধরনের স্তরের সমাজব্যবস্থা থেকে ভিন্ন স্তরের সমাজব্যবস্থায় উত্তরণে নির্ণায়কভূমিকা পালন করে?

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে যে, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সংগ্রহের পদ্ধতিই হল সেই শক্তি। অর্থাৎ জীবন ও সমাজবিকাশের জন্য যা অপরিহার্য সেই অন্ন, বস্ত্র, পাদুকা, ঘরবাড়ি, জ্বালানি, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যবহারিক মূল্য আছে এমন দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতিই হল সেই শক্তি।

বাঁচতে হলে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, জুতো, জ্বালানি প্রভৃতি চাই। ব্যবহারিক মূল্য আছে এমন দ্রব্য পেতে হলে উৎপাদন করতে হবে। আর এগুলি উৎপাদন করার জন্য চাই উৎপাদনের হাতিয়ার। মানুষকে সেই হাতিয়ার তৈরি করা ও তা ব্যবহারের কৌশল শিখতে হবে।

উৎপাদনের যে সব হালহাতিয়ার ব্যবহার করে ব্যবহারিকমূল্য রয়েছে এমন দ্রব্য উৎপাদন করা হয় এবং উৎপাদনের কাজে অভিজ্ঞতা ও দক্ষ শ্রমের কল্যাণে যে মানুষেরা উৎপাদনের এই সব হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করে সমাজে বস্তুগত মূল্য রয়েছে এমন সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে— সেই সমস্ত কিছুর সমষ্টিই হল একটা সমাজের উৎপাদিকা শক্তি।

কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি হল উৎপাদনব্যবস্থার কেবল একটি দিক, উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি দিক। ব্যবহারিক মূল্য আছে এমন দ্রব্য উৎপাদন করতে মানুষ যে প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিগুলিকে কাজে লাগায়, সেই বস্তু ও শক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের দিকটা উৎপাদিকা শক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। উৎপাদনের, উৎপাদন ব্যবস্থার অপর একটি দিক হল— উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। এইটি হল মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্ক। ব্যবহারিক দ্রব্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে কাজে লাগানো এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই— এ দুটি কাজ মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন

ভাবে করে না। এ কাজ বিচ্ছিন্ন ভাবে একা একা কেউ করতে পারে না, করে সকলে মিলে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে, সমাজবদ্ধ ভাবে। তাই সব রকম অবস্থায়, সব সময় উৎপাদন মানেই সামাজিক উৎপাদন। ব্যবহারিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মানুষকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও না কোনও ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কে আসতে হয়, পারস্পরিক সম্পর্কে মিলিত হতে হয়, কোনও না কোনও উৎপাদন সম্পর্কে আসতে হয়।

এই সম্পর্ক কখনও শোষণ থেকে মুক্ত মানুষদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সম্পর্ক, আবার কখনও এই সম্পর্ক প্রভুত্ব এবং গোলামির সম্পর্ক। তা আবার কখনও এক ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক থেকে ভিন্ন ধরনের উৎপাদন সম্পর্কে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন একটা সম্পর্ক হতে পারে। কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র যা-ই হোক, সর্বদা এবং প্রতিটি সমাজব্যবস্থার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিকা শক্তির মতোই তা একটা অপরিহার্য উপাদান।

মার্ক্স বলেছেন— "উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ কেবল প্রকৃতির উপরেই ক্রিয়া করে না, মানুষ নিজেদের মধ্যেও একে অপরের ওপর ক্রিয়া করে। কোনও না কোনও ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা করে, কাজের পারস্পরিক বিনিময় ঘটিয়েই সে উৎপাদন করে। উৎপাদন করার জন্য মানুষকে একে অপরের সঙ্গে বিশেষ ধরনের যোগাযোগ, বিশেষ বিশেষ সম্পর্কে আসতেই হয়। একমাত্র এই সামাজিক যোগাযোগ এবং সম্পর্কে এসেই সে প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করতে, উৎপাদন করতে পারে" (ওয়েজ- লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল)।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন, উৎপাদনের চরিত্র বলতে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক উভয়কেই বোঝায়। ব্যবহারিক দ্রব্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ঐক্যের মূর্ত রূপ হল উৎপাদন।

খ) উৎপাদনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, তা কখনও দীর্ঘদিন এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না। সর্বদাই তার পরিবর্তন এবং বিকাশ ঘটে। তার উপর, উৎপাদনের চরিত্রের পরিবর্তন অবধারিত ভাবে গোটা সমাজব্যবস্থা, সামাজিক ধ্যানধারণা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন ডেকে আনে, গোটা সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের তাগিদ সৃষ্টি করে। সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছে যা, মোটা কথায় বললে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার জন্ম দিয়েছে। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে উৎপাদনের চরিত্র ছিল এক ধরনের। দাস সমাজে উৎপাদনের চরিত্র ছিল ভিন্ন ধরনের। সামন্ততন্ত্রে ছিল তৃতীয় একটা ধরনের—

এ ভাবেই চলেছে। সেই অনুযায়ী মানুষের সামাজিক ব্যবস্থা, ভাবজীবন, দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও বদলেছে।

একটা সমাজের উৎপাদনের চরিত্র যে ধরনের, সেই সমাজের ধ্যানধারণা, তত্ত্ব, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিষ্ঠানগুলিও অর্থাৎ, গোটা সমাজটাই মূলত সেই ধরনের হয়।

অথবা আরও সোজা কথায় বললে— মানুষের জীবনযাত্রার ধরনটি যেমন, তার চিন্তাভাবনার ধরনটিও তেমন হয়।

অর্থাৎ সমাজের বিকাশের ইতিহাস হল, সর্বোপরি উৎপাদনের বিকাশের ইতিহাস, উৎপাদনের চরিত্রের পরিবর্তনের ইতিহাস। শত শত বছর ধরে উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের পথে কী ভাবে নানা চরিত্রের উৎপাদন ব্যবস্থাগুলি একের পর এক এসেছে তার ইতিহাস। উৎপাদিকা শক্তি এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের ইতিহাস।

সুতরাং, সমাজবিকাশের ইতিহাস, একই সঙ্গে, ব্যবহারিক বস্তুগত উৎপাদন করে চলেছে যে মানুষ, তাদের ইতিহাস। শ্রমজীবী মানুষ— যারা উৎপাদন ব্যবস্থায় মূল শক্তি হিসাবে কাজ করে, যারা সমাজের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি উৎপাদন করে— তাদের ইতিহাস।

কাজেই ইতিহাসকে যদি যথার্থই ইতিহাস, যথার্থই একটা বিজ্ঞান হতে হয় তবে সমাজবিকাশ বলতে নিছক কিছু রাজা-রাজড়া আর সেনাপতিদের কীর্তিকলাপকে তা বোঝাতে পারে না, কিছু 'দিগ্বিজয়ী' 'সাম্রাজ্যবিস্তারের' নায়কদের আর তাদের অধীন মানুষের কার্যকলাপকে সমাজবিকাশের ইতিহাস বলে দেখাতে পারে না। ইতিহাসকে যদি বিজ্ঞান হতে হয় তবে সবার উপরে তাকে বাস্তবে উৎপাদন যারা করে তাদের ইতিহাস, শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস, জনগণের ইতিহাস হতে হবে।

সুতরাং, সমাজের ইতিহাসের নিয়মগুলি কী ভাবে জানব তার ইঙ্গিত, কার মনে কী আছে, বা সমাজের মধ্যে কোন ধ্যানধারণা দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত, তার মধ্যে খুঁজলে হবে না। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে, একটি সমাজের প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রের মধ্যে সেই নিয়মকে খুঁজতে হবে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে তা খুঁজতে হবে।

সুতরাং, ইতিহাস-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল, উৎপাদনের নিয়মগুলি, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের নিয়মগুলি, সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলি, উদ্ঘাটন ও অনুধাবন করা।

সুতরাং, যদি একটা দলকে যথার্থই সর্বহারা শ্রেণির দল হতে হয়, তা হলে

সর্বোপরি তাকে উৎপাদনের বিকাশের নিয়মগুলি, সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলি সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

সুতরাং, নীতিগত ক্ষেত্রে ভুলের হাত এড়াতে হলে, সর্বহারা শ্রেণির পার্টিকে, উৎপাদনের বিকাশের নিয়ম, সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মের উপর ভিত্তি করেই তার কর্মসূচি নির্ধারণ ও দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে।

গ) উৎপাদনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল,

উৎপাদনের পরিবর্তন ও বিকাশ শুরু হয় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সঙ্গে, সর্বপ্রথম উৎপাদনের হাতিয়ারের পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তাই, উৎপাদিকা শক্তিই উৎপাদনের সবচেয়ে গতিশীল ও বিপ্লবাত্মক উপাদান। সর্বপ্রথম সমাজের উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে। এই পরিবর্তনের ভিত্তিতে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে না বা উৎপাদিকা শক্তি উৎপাদন সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল হলেও উৎপাদন সম্পর্কও উৎপাদিকা শক্তির উপর ক্রিয়া করে এবং তার এগোনো পিছানোকে ত্বরান্বিত করে। সাথে সাথে এ-ও মনে রাখতে হবে যে, উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি ও বিকাশের তুলনায় উৎপাদন সম্পর্ক দীর্ঘদিন পেছনে পড়ে থাকতে বা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের বিরোধী হয়ে থাকতে পারে না। কারণ উৎপাদিকা শক্তি একমাত্র তখনই পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হতে পারে যখন উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বাস্তব অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং তার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের তুলনায় উৎপাদন সম্পর্ক যতই পিছনে থাকুক না কেন, আজ হোক কাল হোক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের স্তর ও চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের সামঞ্জস্য ঘটতেই হবে এবং বাস্তবে তা ঘটেও থাকে। না হলে উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতর উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ঐক্য মূলেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাঙন ধরবে, উৎপাদনে সংকট দেখা দেবে এবং উৎপাদিকা শক্তির বিনাশ ঘটবে।

উৎপাদিকা শক্তির চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি না হয়, দুইয়ের মধ্যে যদি সংঘাত ঘটে তবে কী হয়— পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক সংকট তারই নজির। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন যন্ত্রের উপর পুঁজিপতিদের

ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্র এবং উৎপাদিকা শক্তির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যে খাপ খায় না, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এর ফলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, যা উৎপাদিকা শক্তির বিনাশ ডেকে আনে। তা ছাড়াও, এই অসামঞ্জস্যই হল সমাজবিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তি। সমাজবিপ্লবের উদ্দেশ্য হল বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের উচ্ছেদ ঘটিয়ে উৎপাদিকা শক্তির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

এর ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক জাতীয় অর্থনীতি, যেখানে উৎপাদিকা শক্তির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক পুরোপুরি সুসমঞ্জস। এখানে উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা উৎপাদিকা শক্তির সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সুসমঞ্জস, তাই অর্থনৈতিক সংকট বা উৎপাদিকা শক্তির বিনাশের কোনও প্রশ্ন এখানে নেই।

ফলে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের ব্যাপারে উৎপাদিকা শক্তি শুধু যে সবচেয়ে গতিশীল ও সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক উপাদান তাই নয়, উৎপাদনের অগ্রগতি ও বিকাশেও তা নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং, উৎপাদিকা শক্তি যেমন, উৎপাদন সম্পর্কটিও তেমন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই।

একটি সমাজে ‘‘কী ধরনের উৎপাদন যন্ত্র দিয়ে মানুষ তার বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উৎপাদন করে?’’ এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় সেই সমাজের উৎপাদিকা শক্তির অবস্থার দিকে তাকালে। অন্য দিকে, জমি, অরণ্য, জল, খনিজ সম্পদ, কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, পণ্য পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, এক কথায় উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা কাদের হাতে? সেগুলি কার নির্দেশে চলে? সামাজিক নির্দেশে? নাকি এমন কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণির নির্দেশে, যারা অপর কিছু ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণিকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে সেগুলিকে ব্যবহার করে?— এই প্রশ্নের উত্তর মেলে উৎপাদন সম্পর্কের দিকে তাকালে।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের একটি মোটামুটি ছবি এখন দেখা যাক। এবড়োখেবড়ো পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারের স্তর থেকে তীর-ধনুক ব্যবহারের স্তরে মানুষ যখন পৌঁছেছিল তখনই শিকারজীবী জীবনযাত্রা থেকে আদিম পশুপালক ও রাখালিয়া জীবনযাত্রায় মানবসমাজের উত্তরণ ঘটে। পাথরের উপকরণ ছেড়ে যখন উৎপাদনে ধাতুনির্মিত (লোহার কুঠার, লোহার ফলা লাগান কাঠের লাঙল) উপকরণ ব্যবহার শুরু হয় তখনই আসে চাষবাসনির্ভর কৃষিজীবী জীবনযাত্রা। এর পর ধাতু গলানো

ও পেটানোর দ্বারা ধাতুনির্মিত উপকরণের আরও অগ্রগতি, কামারের হাপর ব্যবহার ও কুমোরের কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে হস্তশিল্পের উন্নতি ঘটে এবং কৃষিকাজ থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র হস্তশিল্প গড়ে ওঠে।

পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে ক্ষুদ্রশিল্প। হস্তশিল্পের ছোট যন্ত্রপাতি থেকে বড় বড় শিল্পের উপযোগী যন্ত্রের উদ্ভব ঘটে, হস্ত ও কুটিরশিল্পের জায়গায় যন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠে, তার পর আসে আধুনিক বৃহৎশিল্প— এই হল মানবসমাজের ইতিহাসে উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিকাশের, বহুলাংশে অসম্পূর্ণ হলেও, মোটামুটি সাধারণ একটা চিত্র। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, উৎপাদনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল, উৎপাদন যন্ত্রের উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে তাদের হাতেই, মানুষকে বাদ দিয়ে তা হয়নি।

ফলে উৎপাদন যন্ত্রের পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদিকা শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে মানুষেরও পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে। তাদের উৎপাদন কর্মের অভিজ্ঞতা, শ্রমের দক্ষতা, উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতারও পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে।

ইতিহাসের গতিপথে উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে।

ইতিহাসে উৎপাদন সম্পর্কের পাঁচটি প্রধান রূপ আমরা দেখতে পাই, আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র।

আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা। এই উৎপাদন সম্পর্ক সে যুগের উৎপাদিকা শক্তির মূলত পরিপূরক ছিল। পাথরের যন্ত্রপাতি, পরবর্তীকালে তীরধনুক দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তি ও হিংস্র জানোয়ারের বিরুদ্ধে মানুষের একা একা লড়া সম্ভব ছিল না। বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ, মাছ ধরা এবং আস্তানা গড়ার কাজ সকলে মিলেই করতে হত। তাকে বুঝতে হয়েছিল, যদি সে অনাহারে মরতে না চায়, বন্য জন্তুর শিকার হতে না চায়, প্রতিবেশী মানবগোষ্ঠীর হাতে খুন হতে না চায় তবে সকলে মিলেই কাজ করতে হবে। যৌথ শ্রমের ভিত্তিতেই এসেছিল উৎপাদনের উপকরণের ও উৎপাদিত দ্রব্যের উপর যৌথ মালিকানা। নিজস্ব কিছু অস্ত্রশস্ত্র— যা উৎপাদনের কাজে এবং বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হত, তা বাদে, উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা তখনও আসেনি। এ সমাজে শ্রেণিবিভাগ ছিল না, শোষণও ছিল না।

দাসব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে ছিল উৎপাদনের উপকরণের উপর দাসপ্রভুদের মালিকানা। উৎপাদন করে যে শ্রমিক, অর্থাৎ দাস, তারও মালিক ছিল দাসপ্রভু। দাসদের সে জীবজন্তুর মতো বেচাকেনা করতে, খুন করতেও পারত। এই উৎপাদন সম্পর্ক সে যুগের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের স্তরের সঙ্গে প্রধানত সুসমঞ্জস ছিল। পাথরের বদলে মানুষ তখন ধাতুর তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে। শিকারজীবী স্তরের আদিম ও ছন্নছাড়া পশুপালনের বদলে দাসযুগে মানুষ চাষবাস, পশুচারণ এবং কারিগরির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং উৎপাদনের এই বিভিন্ন শাখাকে ঘিরে শ্রমবিভাগ চালু হয়েছে। এই স্তরেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও সমাজে সমাজে পণ্য বিনিময়, অল্প কিছু মানুষের হাতে সম্পদ সঞ্চয় এবং মুষ্টিমেয়ের পক্ষে উৎপাদনের উপকরণের প্রকৃত মালিক হওয়া, মুষ্টিমেয়ের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের অবদমন ও তাদের দাসে পরিণত করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই স্তরে এসে, সমাজের সকল সদস্যের যৌথ ও মুক্ত শ্রম আর আমরা দেখতে পাই না। এখানে দাসদের জবরদস্তি খাটতে বাধ্য করা হয় আর দাসপ্রভুরা খাটে না, দাসদের শোষণ করে। এই স্তরে তাই উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর যৌথ মালিকানা আর দেখা যায় না। যৌথ মালিকানার জায়গা দখল করেছে ব্যক্তিমালিকানা। এই দাসব্যবস্থায় দাসপ্রভুরাই মানবসমাজে প্রথম যথার্থ অর্থে সম্পত্তির অধিকারী একটি প্রধান শ্রেণি হিসাবে দেখা দেয়।

ধনী এবং দরিদ্র, শোষক ও শোষিত, সকল অধিকার যাদের করায়ত্ত এমন একদল মানুষ, আর কোনও অধিকার নেই এমন আর একদল— এই দু-দলের মধ্যে তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম— এই হল দাসসমাজের চেহারা।

সামন্ততন্ত্রে উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হল এমন একটা অবস্থা যেখানে সামন্তপ্রভুরা উৎপাদনের উপকরণের মালিক, কিন্তু যারা শ্রম দিয়ে উৎপাদন করে সেই ভূমিদাসদের পূর্ণ মালিক তারা নয়। তারা ভূমিদাসদের বেচতে পারে, কিনতে পারে, কিন্তু হত্যা করতে পারে না। এই সামন্তী মালিকানার পাশাপাশি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং নিজের শ্রমে পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগের উপর চাষি এবং হস্তশিল্পের কারিগরদের ব্যক্তিগত মালিকানাও চালু ছিল। সেই যুগে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের যা স্তর এই ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক মূলত তার পরিপূরক। এর পর লোহা গলাবার এবং লোহার জিনিষ বানানোর কাজ আরও উন্নত হল। লোহার ফলা দেওয়া লাঙল এবং তাঁতের প্রচলন ঘটল। কৃষি, উদ্যান, আঙুর বাগিচা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনের বিকাশ ঘটল। হস্তশিল্পের কারিগরদের ছোট ছোট কর্মশালার পাশাপাশি ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠল। এ যুগের উৎপাদিকা শক্তির এগুলিই ছিল মূল বৈশিষ্ট্য।

নতুন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজন শ্রমিকের কর্মোদ্যাগ, কর্মমুখিনতা ও কাজের প্রতি আগ্রহ। মেহনতি মানুষ হিসাবে দাসদের কাজে আগ্রহ ছিল না, উদ্যোগ তো একেবারেই ছিল না। কাজেই সামন্তপ্রভুরা দাসদের বাদ দিল এবং ভূমিদাসদের যাদের নিজস্ব গৃহপালিত পশু আছে, চাষের যন্ত্রপাতি আছে, জমি চষবার জন্য যা যা করা দরকার সেই কাজে আগ্রহ আছে এবং উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ সামন্তপ্রভুকে দিতে যারা রাজি, কাজের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করল।

এই স্তরে এসে ব্যক্তি মালিকানার আরও বিকাশ ঘটেছে। এই স্তরে শোষণ প্রায় দাসপ্রথার মতোই নির্মম, উনিশ-বিশ মাত্র কম। শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণি সংগ্রামই সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, পুঁজিপতিরা এখানে উৎপাদনের উপকরণের মালিক। কিন্তু মজুরির বিনিময়ে কাজ করে যে শ্রমিক, পুঁজিপতিরা তাদের মালিক নয়। তারা ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীন, তাই পুঁজিপতি তাকে বেচতে বা খুন করতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীন হলেও উৎপাদনের হাতিয়ার তথা যন্ত্রপাতির মালিকানা না থাকায় পেটের দায়ে, বাঁচার তাগিদে পুঁজিপতিদের কাছে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে তারা বাধ্য। শোষণের জোয়াল নিজের কাঁধে বওয়া ছাড়া তাদের কোনও উপায় থাকে না। উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার পাশাপাশি, পুঁজিবাদের গোড়ার দিকে উৎপাদনের হাতিয়ারের ওপর কৃষক ও কারিগরদের ব্যক্তিমালিকানাও ব্যাপক হারেই দেখা যায়। এই কৃষক ও কারিগররা আর ভূমিদাস নয়। তাদের নিজস্ব সম্পত্তি ব্যক্তিগত শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সঙ্গে কারিগরদের কর্মশালা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগের জায়গায় যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত বড় বড় মিল ও ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। আদিম যুগের যন্ত্রপাতি দিয়ে কৃষকরা যে সব জমিদারি জোত চাষ করত সেগুলো লুপ্ত হয়ে সেখানে উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চষা বিশাল বিশাল পুঁজিবাদী কৃষিখামার গড়ে ওঠে।

নয়া উৎপাদিকা শক্তির জন্য তুলনায় বেশি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। নিপীড়িত, অজ্ঞ ভূমিদাস দিয়ে চলবে না, নয়া উৎপাদিকা শক্তির জন্য দরকার এমন শ্রমিকের যে যন্ত্রপাতি বোঝে এবং তা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারে। কাজেই পুঁজিপতিরা চাইল মজুরি-শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করতে, যারা ভূমিদাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত এবং যন্ত্রপাতি ঠিক মতো ব্যবহার করার মতো শিক্ষা যাদের আছে।

কিন্তু উৎপাদিকা শক্তির বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়ে, পুঁজিবাদ এমন সঙ্কটে

জর্জরিত হয়ে পড়ে যার সমাধান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে ও ক্রমাগত দাম কমাতে কমাতে পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতাকে ক্রমাগত তীব্র করে, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সম্পত্তির মালিকগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে তাদের সর্বহারায় পরিণত করে, তাদের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমিয়ে দেয়। ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্য দিকে উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়ে এবং বড় বড় মিল ও ফ্যাক্টরিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে একত্রে কাজে লাগিয়ে পুঁজিবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সামাজিক চরিত্র দেয় এবং এর দ্বারা নিজের টিকে থাকার বনিয়াদকেই সে দুর্বল করে তোলে। দুর্বল করে এই অর্থে যে, উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর সামাজিক মালিকানা দাবি করে। কিন্তু বাস্তবে উৎপাদনের হালহাতিয়ারের উপর থাকে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানা, যা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

পর্যায়ক্রমে অতি উৎপাদনের সঙ্কটের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তির সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের এই অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়। পুঁজিবাদ নিজেই ব্যাপক জনগণকে নিঃস্ব করে ফেলে এবং সেই কারণে পুঁজিপতিরা দেখে বাজারে পণ্য বেচার মতো কার্যকরী চাহিদা নেই। তখন তারা পণ্য পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়, তৈরি মাল নষ্ট করে দেয়। পুঁজিপতিরা উৎপাদন সাময়িক বন্ধ করে উৎপাদিকা শক্তিকে ফেলে রেখে নষ্ট করে। এ সবই তারা করে এমন একটা সময়ে, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকারির জ্বালায় জ্বলছে, অনাহারে মরছে। উৎপাদন কম বলে এমনটা ঘটে না, ঘটে পণ্যের অতি উৎপাদনের জন্যে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, উৎপাদিকা শক্তি যে স্তরে পৌঁছেছে, পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারছে না, বরং অনিরসনীয় দ্বন্দ্বই ডেকে আনছে।

এর অর্থ, পুঁজিবাদ বিপ্লব-সম্ভাবনার জঠরবেদনায় কাঁপছে, যে বিপ্লবের লক্ষ্য— উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর বিদ্যমান পুঁজিবাদী মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা।

এক কথায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শোষক ও শোষিতের মধ্যে তীব্রতম শ্রেণিসংগ্রাম।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনসম্পর্কের ভিত্তি হল উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা। এখনও পর্যন্ত এই ব্যবস্থা একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে এখন আর শোষক-শোষিত নেই। এখানে উৎপাদিত দ্রব্য প্রত্যেকের শ্রম অনুযায়ী বণ্টিত হয়, যার মূলে রয়েছে— "যে

খাটবে না, সে খাবে না'' এই নীতি। এখানে মানুষে মানুষে উৎপাদনসম্পর্ক, বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা, শোষণমুক্ত শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক সমাজতান্ত্রিক সহায়তার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনসম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির চরিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ারের ওপর সামাজিক মালিকানা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্রকেই আরও শক্তিশালী করে।

এই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে অতি উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অসঙ্গতি নেই।

এই কারণে, এখানে উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি হয় খুব দ্রুত। পরিপূরক উৎপাদনসম্পর্ক এ ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তির অবাধ বিকাশের পথ খুলে দেয়।

এই হল মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের চিত্র।

উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের উপর, অর্থাৎ প্রধানত উৎপাদনের হাতিয়ারের ক্রমাগত উন্নতির উপর উৎপাদনসম্পর্কের নির্ভরশীলতার ধরনটাই এমন যে উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি ঘটলে তা উৎপাদনসম্পর্কের অনুরূপ ও পরিপূরক পরিবর্তন ঘটায়, তা আজ হোক বা দু'দিন পর হোক। মার্ক্স বলেছেন,

"শ্রমের হাতিয়ারের নির্মাণ ও ব্যবহার কয়েক প্রজাতির পশুর মধ্যে ভ্রূণাকারে দেখা গেলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি মানুষের শ্রমপ্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন, মানুষ হল হাতিয়ার নির্মাতা জীব। বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণীদের সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে তাদের অস্থি-কংকালের জীবাশ্ম যেমন মূল্যবান তেমনই সমাজের বিলুপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অতীতের শ্রম-হাতিয়ারের স্মারকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কী কী জিনিস তৈরি হচ্ছে, তা দিয়ে শুধু নয়, বরং কী ভাবে কোন কোন হাতিয়ার দিয়ে তা তৈরি হচ্ছে, তা থেকেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগের পার্থক্য আমরা নির্ণয় করতে পারি। শ্রমের হাতিয়ার শুধু মানুষের শ্রম-দক্ষতার বিকাশের স্তরই নির্দেশ করে না, সেই সঙ্গে কোন সামাজিক অবস্থায় সেই শ্রম করা হয়েছে তা-ও দেখিয়ে দেয়।''(ক্যাপিটাল ১ম খণ্ড)

মার্ক্স আরও দেখিয়েছেন— "সামাজিক সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। নতুন উৎপাদিকা শক্তি আয়ত্ত করার জন্য মানুষ উৎপাদনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় এবং উৎপাদনের প্রকৃতিতে, রুজিরোজগারের উপায়ে পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে মানুষ তার সমস্ত সামাজিক সম্পর্কগুলির পরিবর্তন ঘটায়। হস্তচালিত কল যে সমাজ এনেছিল সেখানে ছিল সামন্তপ্রভু, বাষ্পচালিত

কল এনেছে তেমন সমাজ, যেখানে রয়েছে শিল্পমালিক, পুঁজিপতি।''(পভার্টি অফ ফিলজফি)

"উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটে চলেছ অবিরাম। সামাজিক সম্পর্কগুলি ক্রমাগত ধ্বংস হচ্ছে, নতুন নতুন ধারণা গড়ে উঠছে। নির্বিশেষ গতিই হল একমাত্র, যার কোন পরিবর্তন নেই।'' (পূর্বোক্ত)

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে যে ধারণা তুলে ধরা হয়েছে, সে সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন—

"প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং প্রধানত তা থেকে উদ্ভূত সমাজকাঠামোই হল বনিয়াদ, যার উপর সেই যুগের রাজনৈতিক এবং চিন্তাগত ইতিহাস দাঁড়িয়ে থাকে। ... সেই অনুসারেই, জমির উপর আদিম যৌথ মালিকানার অবসানের পর থেকে মানবসমাজের গোটা ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। সমাজ বিবর্তনের নানা স্তরে শোষক ও শোষিত, শাসক ও পদানত শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস। এই শ্রেণিসংগ্রাম এখন এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছেছে যখন সমাজের বুক থেকে শোষণ, উৎপীড়ন ও শ্রেণিসংগ্রামের চিরতরে অবসান না ঘটিয়ে শোষিত ও উৎপীড়িত শ্রেণি (সর্বহারা) শোষক ও উৎপীড়ক শ্রেণির (বুর্জোয়া) কবল থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারে না।'' (কমিউনিস্ট ইস্তাহার)

ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও তার পরিপূরক নতুন উৎপাদন সম্পর্ক পুরনো ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে, পুরনো ব্যবস্থার অবলুপ্তির পর গড়ে ওঠে না। পুরনো ব্যবস্থার গর্ভেই তার উদ্ভব। মানুষের ইচ্ছানুসারে, মানুষের সচেতন কার্যকলাপের ফলেও তা গড়ে ওঠে না, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অগোচরে, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই তা গড়ে ওঠে। স্বতঃস্ফূর্ত ও মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবে গড়ে ওঠার কারণ দুটি।

প্রথমত, মানুষ খুশিমতো যে কোনও ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া বেছে নিতে পারে না। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন পূর্বপুরুষদের কর্মপ্রচেষ্টায় সৃষ্ট উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক সে বিদ্যমান বাস্তব হিসাবে পায়। ফলে বস্তুগত উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিদ্যমান সব কিছুকে মেনে নিতে হয় এবং তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষ যখন উৎপাদিকা শক্তির কোনও একটি উপাদান বা উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির কোনও একটির উন্নতি ঘটায় তখন সেই উন্নয়নের

সামাজিক ফলাফল কী হবে তা সে বোঝে না। তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, সে দিকে ফিরেও দেখে না। মানুষ তার নিত্যদিনের প্রয়োজন, শ্রমের ভার লঘু করার দিকটাই ভাবে। সরাসরি ও হাতেনাতে কী কী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সেটুকুই নজর করে।

আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে যখন কিছু মানুষ ক্রমাগত হাতড়ে হাতড়ে, ঠেকতে ঠেকতে শিখে পাথরের হাতিয়ারের বদলে লোহার হাতিয়ার ব্যবহারের ক্ষমতা আয়ত্ত করে, তখন তাদের সেই আবিষ্কারের সামাজিক ফলাফল কী হবে তা তারা বোঝেনি, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও বসেনি। তারা বুঝতে পারেনি, তাদের মাথাতেই আসেনি, ধাতুর হাতিয়ার ব্যবহার আসলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব যা ভবিষ্যতে শেষ পর্যন্ত দাসব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। তারা সেদিন কেবল তাদের কঠোর শ্রমের বোঝা হালকা করতেই চেয়েছিল, হাতেনাতে আশু কিছু সুবিধা পেতে চেয়েছিল। তাদের সচেতন প্রয়াস দৈনন্দিন ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে, ইউরোপে যখন নবীন বুর্জোয়া শ্রেণি 'গিল্ড' পরিচালিত ছোট ছোট কারিগরি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বড় বড় কারখানা গড়ে তোলা শুরু করেছিল এবং তার দ্বারা সমাজের উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি ঘটাচ্ছিল, তখন তাদের নতুন উদ্ভাবনের সামাজিক ফলাফল কী হবে, তা তারা জানত না বা জানার চেষ্টাও করেনি। তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি এই "ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান"গুলির উদ্ভবের ফলে সামাজিক শক্তির এমন পুনর্বিন্যাস ঘটবে যা শেষ পর্যন্ত বিপ্লব ঘটিয়ে দেবে। যে রাজশক্তির আনুকূল্যকে বুর্জোয়ারা এত মূল্যবান মনে করেছে, যে অভিজাত সমাজে ঠাঁই পাওয়ার জন্য অগ্রণী বুর্জোয়ারা অভিলাষ পোষণ করেছে— সেই রাজশক্তি ও অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধেই বিপ্লব ঘটাবে। তারা শুধু উৎপাদন ব্যয় কমাতেই চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল এশিয়া এবং সম্প্রতি আবিষ্কৃত আমেরিকার বাজারে আরও বেশি পরিমাণে মাল পাঠাতে, আরও বেশি মুনাফা লুঠতে। তাদের সচেতন কার্যকলাপ নগদপ্রাপ্তির এই অতি সাধারণ উদ্দেশ্যটুকুর সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল।

যখন রুশ পুঁজিপতিরা বিদেশি পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রবল উদ্যোগে রাশিয়ায় আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করে, তখন তারা জারতন্ত্রকে অটুট রেখে, কৃষকদের জমিদারের করুণার উপর ছেড়ে রেখেই তা করতে চেয়েছিল। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তির এই বিপুল বৃদ্ধির সামাজিক পরিণাম কী হবে— তা তারা জানত না, এনিয়ে তারা মাথাও ঘামায়নি। পুঁজিপতিরা ধরতে বা বুঝতে পারেনি যে উৎপাদিকা শক্তির এই বিপুল বৃদ্ধির ফলে সামাজিক

শক্তিগুলির যে পুনর্বিন্যাস ঘটবে, তার ফলে সর্বহারা শ্রেণি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে পারবে। তারা শুধু চেয়েছিল শিল্পোৎপাদন যত দূর সম্ভব বাড়াতে, দেশের বিরাট বাজার কব্জা করতে, তার উপর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে এবং জাতীয় অর্থনীতি নিংড়ে যতটা বেশি সম্ভব মুনাফা করতে। তাদের সচেতন কর্মকাণ্ড এই সংকীর্ণ ও বাস্তব লাভালাভের গণ্ডি ছড়িয়ে যেতে পারেনি। এ জন্যই মার্ক্স বলেছেন— "সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় (অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যযুক্ত বস্তুগত উৎপাদন করতে গিয়ে— স্ট্যালিন) মানুষকে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্কে আসতে হয়, যা অপরিহার্য এবং মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সুনির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই গড়ে ওঠে।" (এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি, ভূমিকা)

অবশ্য এ কথার মানে এই নয় যে, উৎপাদন সম্পর্কের এই পরিবর্তন— পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক থেকে নতুন উৎপাদন সম্পর্কে উত্তরণ— মসৃণ ভাবে, কোনও রকম তোলপাড় ছাড়া, সংঘাত ছাড়াই ঘটে। বরং ঘটে ঠিক উল্টোটাই। বিপ্লবের আঘাতে পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের উচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সাধারণত এই উত্তরণ ঘটে থাকে। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের বিকাশের পথে কিছুদূর পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটে স্বতস্ফূর্ত ভাবে, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই। কিন্তু তা ঘটে একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত। যত দিন না নতুন ও বিকাশশীল উৎপাদিকা শক্তি উপযুক্ত পরিণতি লাভ করে ততদিন এ ভাবে চলে। কিন্তু নতুন ও বিকাশশীল উৎপাদিকা শক্তি উপযুক্ত পরিণতিতে পৌঁছানোর পর বিদ্যমান উৎপাদনসম্পর্ক এবং তার প্রতিভূরা— অর্থাৎ শাসক শ্রেণি— উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বাধা একমাত্র নবীন শ্রেণিগুলির সচেতন ক্রিয়ার দ্বারা, বলপ্রয়োগের দ্বারা, বিপ্লবের দ্বারাই দূর করা সম্ভব। বলপ্রয়োগ করে পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের অবসান ঘটানো যার লক্ষ্য, সেই নবীন সামাজিক ভাবধারা, নবীন রাজনৈতিক সংগঠন, নবীন রাজনৈতিক শক্তির যুগান্তকারী ভূমিকা এ ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট ভাবে বেরিয়ে আসে। নতুন উৎপাদিকা শক্তি এবং পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে, সমাজের নতুন অর্থনৈতিক চাহিদা থেকে নতুন সামাজিক ভাবধারার জন্ম হয়। নতুন ভাবধারা জনগণকে সংগঠনের মধ্যে টেনে আনে। তাদের উজ্জীবিত করে। জনগণকে একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করে। জনগণ একটা নতুন বিপ্লবী শক্তির জন্ম দেয় এবং সেই শক্তির

জোরে জনগণই পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের উচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। বিকাশের শান্ত স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া মানুষের সচেতন কর্মকাণ্ডকে পথ ছেড়ে দেয়, শান্তিপূর্ণ বিকাশের বদলে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে, বিবর্তনের কাল পার হয়ে আসে বিপ্লব।

মার্ক্স বলেছেন— "বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংগ্রামে, পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ীই সর্বহারাদের একটি শ্রেণি হিসাবে সংগঠিত হতে হয়। .... বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে শাসক শ্রেণিতে পরিণত করে এবং তার পর বলপ্রয়োগে পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটায়।" (কমিউনিস্ট ইস্তাহার)

তিনি আরও বলেছেন— "সর্বহারা শ্রেণি তার রাজনৈতিক আধিপত্যের জোরে বুর্জোয়াদের সমস্ত পুঁজি ধাপে ধাপে কেড়ে নেবে, উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার রাষ্ট্রের হাতে অর্থাৎ শাসক শ্রেণি হিসাবে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত করবে এবং যত দ্রুত সম্ভব উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটাবে।"

"সমাজ যখন নবজন্মের অপেক্ষায় অধীর, শক্তি তখন ধাত্রীর ভূমিকা নেয়।" (কমিউনিস্ট ইস্তাহার)

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কথাগুলি অনন্য প্রতিভার সাহায্যে চমৎকার ভাবে তুলে ধরে মার্ক্স ১৮৫৯ সালে তার বিখ্যাত বই 'ক্রিটিক অব দি পলিটিক্যাল ইকনমি'র মূল্যবান ভূমিকায় বলেছেন— "সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষকে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্কে আসতে হয়, যা অপরিহার্য এবং মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সুনির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই গড়ে ওঠে। এই সমস্ত উৎপাদন সম্পর্কগুলি মিলেই তৈরি হয় একটা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো। এইটিই হল প্রকৃত 'বনিয়াদ' যার উপর গড়ে ওঠে আইনি ও রাজনৈতিক উপরিসৌধ। সামাজিক চেতনার সুনির্দিষ্ট রূপরেখাটিও হয় ওই বনিয়াদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জীবনের বস্তুগত উৎপাদন পদ্ধতিই মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবন প্রক্রিয়ার নির্ণায়কের ভূমিকা নেয়। মানুষের চেতনা তার বস্তুগত জীবনকে নির্ধারণ করে না, বরং তার সামাজিক অস্তিত্ব তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। বিকাশের একটা স্তরে পৌঁছে, সমাজের উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের, অর্থাৎ আইনের ভাষায় বললে সম্পত্তির যে ধরনের মালিকানা সম্পর্কের আওতায় উৎপাদিকা শক্তি এত দিন কাজ করছিল তার, সংঘাত দেখা দেয়। তখন এই উৎপাদন সম্পর্ক, যা এত দিন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকেই সূচিত করছিল, তা শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখনই আসে সমাজবিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক ভিত্তি বদলে যাওয়ার সাথে বিশাল

উপরিসৌধও কমবেশি দ্রুত বদলে যায়। এই পরিবর্তনকে বিচার করার সময় অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাবজগতের পরিবর্তনের পার্থক্যটি সবসময় খেয়ালে রাখা দরকার। উৎপাদনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বস্তুগত পরিবর্তনকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মতো নিখুঁত ভাবে নিরূপণ করা যায়। কিন্তু আইনি, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, দার্শনিক, নান্দনিক, এক কথায় ভাবজগতের ক্ষেত্রে নতুন ও পুরনোর দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়। কোনও এক ব্যক্তির মূল্যায়নের সময় যেমন সেই ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কী ভাবেন তার ভিত্তিতে আমরা মূল্যায়ন করি না, তেমনই পরিবর্তনের যুগপর্যায়কে সমসাময়িক প্রচলিত যুগভাবনা দিয়েও আমরা বিচার করতে পারি না, বরং সেই সমসাময়িক যুগভাবনাকে বস্তুগত জীবনের দ্বন্দ্বের নিরিখে, সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের নিরিখেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। একটি সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের যত দূর সুযোগ থাকে, পূর্ণব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সে সুযোগ যত দিন না নিঃশেষিত হয় তত দিন সেই ব্যবস্থার অবসান ঘটে না। পুরনো সমাজের গর্ভে নতুনের গর্ভবাসের মেয়াদ পূর্ণ না হলে অর্থাৎ, নবজন্মের বাস্তব শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে না। তাই মানবসমাজ সর্বদাই কেবল তার সামনে কর্তব্য হিসাবে সেই লক্ষ্যই নির্দিষ্ট করেছে, যা তার পক্ষে সমাধা করা সম্ভব। খুব খুঁটিয়ে দেখলে আমরা সর্বদা দেখতে পাব, কোনও সমস্যা সমাধানের, কোনও কর্তব্য সমাধার প্রয়োজন তখনই অনুভূত হয় যখন তা সমাধানের বাস্তব জমি তৈরি হয়ে গিয়েছে বা জমি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।''

মার্ক্সীয় বস্তুবাদকে সমাজজীবন ও সমাজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে এগুলিই আমরা পাই।

এগুলিই হল দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বৈশিষ্ট্য। □

(রচনাকাল ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)

[জে ভি স্ট্যালিন, প্রবলেমস অব লেনিনিজম, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৪৭, সংস্করণে প্রদত্ত ইংরেজি টেক্সট থেকে অনূদিত। অনুবাদের ত্রুটি বিচ্যুতির দায়িত্ব আমাদের। — সম্পাদক, গণদাবী]